BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010033
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

# বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী : প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ, অভিনবত্ব ও পাশ্চাত্যনুসরণ

**Sutapa Singha Mahapatra**

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

## Abstract:

*বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করে, যেখানে কাহিনীর চেয়ে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এটিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোনো প্রতিবন্ধী চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। 'রজনী' চরিত্রটি জন্ম থেকেই অন্ধ এবং তাকে তার পালক পিতা-মাতা দারিদ্র্য সত্ত্বেও পরম স্নেহে লালন-পালন করেন। অন্ধত্বের কারণে তার বিবাহ না হলেও, সে ছিল পরমাসুন্দরী। রজনীর জীবনে শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই স্পর্শ ও শ্রবণানুভূতিই তাকে শচীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই প্রণয় অনুভূতির স্ফুরণে চক্ষুমান বা জন্মান্ধতার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই, বরং চক্ষুহীনা নারী তার অন্তরের শক্তিতে মানব-অন্তরের রূপ বেশি উপলব্ধি করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটি সৃষ্টিতে লর্ড লিটন প্রণীত 'The Last Days of Pompeii' উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালী 'নিদিয়া' চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে নিদিয়া ও রজনী চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও লক্ষণীয়। যেখানে নিদিয়ার প্রেম ছিল বেগবতী, সেখানে রজনীর প্রেম শান্ত ও নিস্তরঙ্গ এবং তার নিকট কর্তব্যের স্থান ছিল অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে। উপন্যাসের শেষে রজনী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং শচীন্দ্রনাথের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মফলবাদ ও নিয়তিবাদের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 'রজনী' নামকরণটি অন্ধ যুবতীর চির-অন্ধকারময় জগতের ইঙ্গিত বহন করে, যা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মুন্সিয়ানার পরিচয়।*

Key Words: *বঙ্কিমচন্দ্র, রজনী, নিদিয়া, প্রতিবন্ধী চরিত্র, মনস্তত্ত্ব, পাশ্চাত্যনুসরণ।*

## Introduction:

বাংলা কথাসাহিত্যে সম্ভবত প্রথম প্রতিবন্ধী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাসের (১৮৭৭) 'রজনী' এবং রচনারীতির দিক থেকে 'রজনী' বাংলা সাহিত্যে নতুন শ্রেণীর উপন্যাস। রজনীতে কোনো একটি চরিত্র একমাত্র বক্তা নয়। উপন্যাসের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র আখ্যায়িকার কোনো না কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন এবং তাদের পরস্পরের বর্ণনার সংযোজনায় সমগ্র কাহিনীটি রূপায়িত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম এইরূপ রচনার প্রথম প্রবর্তক হলেও এটি যে নূতন নয় উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি তার উল্লেখ করেছেন। 'রজনী'র কোনো চরিত্রকেই আমরা একমাত্র তার অথবা অপর কোনো একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকের কাহিনী অপর সকলের কাহিনীর উপর আলোকপাত করে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র গড়ে তুলেছে৷ যাই হোক, রচনাপ্রণালীর অভিনবত্বই 'রজনী'র একমাত্র আকর্ষণ নয়৷ এটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। 'রজনী' বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস যাতে কাহিনী অপেক্ষা মনস্তত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

**Discussion:**

কাশীনিবাসী হরেকৃষ্ণ দাসের একটি মাত্র কন্যাসন্তান। কিন্তু তাকে নিয়ে হরেকৃষ্ণ দম্পতির চিন্তার অন্ত নেই। কারণ কন্যাটি জন্মান্ধ। কন্যার শৈশবেই তার মায়ের মৃত্যু হলে পিতা একা জন্মান্ধ কন্যার দায়িত্বভার গ্রহণে অপারগ হওয়ায় কলকাতা নিবাসী শ্যালিকাপত্নী রাজচন্দ্র দাসকে কন্যাভার সমর্পণ করেন। নিঃসন্তান রাজচন্দ্র দম্পতি দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও অন্ধ বালিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সামান্য ফুল বিক্রি করে তাদের সংসার অতিবাহিত হচ্ছিল। তারা জন্মান্ধ কন্যাটিকে কোনোদিনের জন্যও জানতে দেননি যে রাজচন্দ্র দম্পতি রজনীর 'Biological parent' নন। বরং দীর্ঘ কুড়ি বছর পরম আদর যত্নে প্রতিপালন করেছেন। মেয়ের বয়স দুই দশক হয়ে যাওয়াতেও তারা নিজেদের খুব বেশি কন্যাভারদায়গ্রস্ত বলে চিন্তিতও বোধ করেননি। সে যে এক ফুলওয়ালী-মালি দম্পতির কন্যা নয় –একথা রজনীও কোনোদিন জানত না।

অন্ধত্বের কারণে বিবাহযোগ্যা হলেও রজনীর বিবাহ হয়নি। কিন্তু রজনী পরমাসুন্দরী। রজনীর রূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শচীন্দ্র বলেছেন-

> "রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন, বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিনীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল, মৃদু, স্থির, এবং অন্ধতা বশতঃ সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর, এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দরশরীরে, সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।"১

রজনীর যে বিয়ে হয়নি- হবেও না অন্ধত্বের কারণে সেটা খুব ভাল করেই জানে সে নিজে। এই বিবাহ প্রসঙ্গে রজনীর সমান্তরাল দু'টি মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। একবার সে বলেছে তার যে বিয়ে হয়নি তাতে নাকি ভালই হয়েছে। কত বিবাহিতা রমণীরা বলেছে কাণা ফুলওয়ালীই বরং ভাল। চক্ষুষ্মতী রমণীরা তাদের কটাক্ষপাতেও পুরুষমনে প্রবেশ করতে পারেনি বা দাম্পত্যজীবনে খুশী নয়। এটা রজনীর জবানীতে-

> "কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, আহা আমিও যদি কাণা হইতাম!"২

কিন্তু ঠিক এর পরই রজনী আবার বলেছে-

> "বিবাহ না হউক-তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম।"৩

অন্ধ রজনীর সতের বছর বয়সে তার মনে যে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে তারই স্ফুরণমাত্র দৃষ্ট। রজনীও কাউকে ভালোবাসতে চায়। কারো ভালোবাসা পেতে চায়। মজার বিষয়, রজনী যে স্বয়ম্বরা হল, সেই বিবাহ একটি নয়, দু'টি ঘটল। একটি কলকাতার রাস্তার মনুমেন্ট, আরেকটি চার বছরের বালক বামাচরণ-

> "মনে মনে মনুমেন্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেন্টমহিষী। কেবল একটা বিবাহ নহে। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই- আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। ...কালীবসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। ...বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল- 'আমি বল হব'। তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, কাঁদিস না- তুই আমার বর।"৪

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন দোষ কাটানোর প্রথা উল্লিখিত হয়েছে। রজনীও হয়ত তার প্রথম বিবাহ মনুষ্যেতর প্রাণীর সাথে সম্পন্ন করে তার বিবাহজনিত দোষ বাধা কাটালো। দ্বিতীয় বিবাহ বয়সে অনেক ছোট এক বালকের সঙ্গে রজনীর সম্পন্ন হল। এর মধ্যে রজনীর মনে জন্মান্তরের কোনো দোষ কাটানোর স্পৃহা জাগরিত। মনে পড়ে মদন-রতি উপাখ্যানের অনুষঙ্গ। দৈব-অভিশাপে আজ রজনী জন্মান্ধ। কিন্তু তার মনে রয়েছে প্রেমাকাঙ্খা। তাই সে এজন্ম ও গত জন্মের সমস্ত বিবাহজনিত বাধা কাটিয়ে উঠতে উন্মুখ।

এহেন রজনীর মনে এল প্রেমের পরশ। যে রামসদয় বাবুর বাড়ি রোজ ফুল দিতে যায় কাণা ফুলওয়ালি, তাদেরই বাড়ির ছোট ছেলে শচীন্দ্রনাথ। ঘটনা পরম্পরায় একদিন হঠাৎই শচীন্দ্র-রজনীর সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে শচীন্দ্র প্রথম দর্শনেই রজনীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন৷ কিন্তু তার রূপ দেখে নয়, শচীন্দ্র রজনীর দৃষ্টিহীনতার বিষয়ে বিশেষ সহমর্মী হয়ে ওঠে। জানা যায় রজনীর এই দৃষ্টিহীনতা সারবার নয়। সে জন্মান্ধ। কিন্তু কাহিনির অন্তিমে দেখি রজনীর তমসাবৃত জীবনের অবসান ঘটেছে। যথাযথ চিকিৎসায় রজনী চোখের আলো ফিরে পেয়েছে।

রজনী দৃষ্টিহীন হলেও তার জগতে আছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় অনুভূতির জগৎ। ফুলে ফুলে ভরা তার জীবন। রজনীর চক্ষু-পরীক্ষার জন্য শচীন্দ্রর প্রথম পরশ রজনীর জীবনে এক শিহরণ জাগিয়ে তোলে। রজনীর দৃষ্টিহীনতা শব্দ এবং গন্ধ দ্বারা পূরিত হয়। তার জীবনে আছে গানের সুরমূর্ছনাও। শচীন্দ্র রজনীর সাক্ষাতে একই সঙ্গে রজনীর জীবনে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব এবং পাশাপাশি শচীন্দ্রর মনে রজনীর প্রতি প্রেম নয় করুণার উদ্রেক৷ শচীন্দ্র কাণা ফুলওয়ালীর চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারবে না, তাই তার বিবাহে প্রবৃত্ত হল। যত টাকাই লাগুক না কেন, রজনীর জীবন গড়ে দিতে চাইল। একটি পাত্রও ঠিক করল। কিন্তু শচীন্দ্রর প্রতি প্রেমাসক্ত রজনী গৃহত্যাগ করে সেই বিবাহ আটকালো। এখান থেকে রজনীর জীবনেও রাস্তাবদল ঘটল। চেনা পরিচিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নতুন পরিমন্ডলের সাথে পরিচয় ঘটল তার।

পরিচয় ঘটল অমরনাথের সঙ্গে। বিপন্ন অন্ধনারীকে সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধারই করলেন না অমরনাথ, পাশাপাশি রজনীর প্রকৃত পিতৃপরিচয় অবগুণ্ঠন মোচন করল এবং এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হল কপর্দকহীনা রজনী। শুধু আর্থিক সৌভাগ্যেরই যে অধিকারী হল তা নয়, শেষাবধি স্বামী-পুত্র এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নতুন এক জীবন পেল রজনী। শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ শেষাবধি হলেও রজনী এবং অমরনাথের মধ্যেও এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সম্পর্ক ছিল সম্ভ্রমতার। অমরনাথ রজনীর কাছে জীবনত্রাতা, জীবনদাতা। তাই অমরনাথের উপস্থিতিতে শচীন্দ্র ও রজনীর বিবাহের প্রস্তাব এলে রজনীর মনে যতই শচীন্দ্রর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা থাকুক না কেন, অমরনাথের অভিভাবকত্ব ভেঙে বেরয়নি। রজনীর মনের কৃতজ্ঞতাবোধ অন্ধপ্রেম আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

রজনীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চাইলেন এক জন্মান্ধ নারীর পুরুষের প্রতি সক্রিয় প্রেমানুরাগ এবং তার প্রণয়ানুভূতির বিকাশ ও উন্মীলন। নারী হৃদয় মানেই প্রেমাতুর। সেখানে প্রণয়ানুভূতির স্ফুরণে চক্ষুমান বা জন্মান্ধতার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। বরং চক্ষুহীনা নারী তার অন্তরের শক্তিতে মানব-অন্তরের রূপ বেশি উপলব্ধি করতে পারে। জন্মান্ধ নর-নারী শব্দ ও স্পর্শের মাধ্যমে অধিকতর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারে। জন্মান্ধ মানুষের কাছে শব্দ এবং স্পর্শ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রজনী চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। রজনী শচীন্দ্রের সুকোমল পরশ বুঝেছে। এই দেহজ আকর্ষণ পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের দ্বারা চিত্রিত।

শুধু স্পর্শ নয়, শব্দও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে জন্মান্ধ রজনীর জীবনে। শচীন্দ্ররও শব্দও অতি সুমধুর ঠেকেছে রজনীর কানে। এই সুকোমল স্পর্শ এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরই অন্ধ রমণীর মনে প্রেমের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। প্রেম মনের ব্যাপার। সাধারণ নরনারীর মনে যেমন প্রেম আসে প্রতিবন্ধীর মনেও আসে প্রেম। বরং শারীরিকভাবে কোনো একটি অঙ্গের প্রতিবন্ধকতার দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে ওঠে তাদের মনের চোখ দিয়ে। মানুষ সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। হৃদয়দৌর্বল্য মনের কথা দ্বারাও অনেক সময় মানুষকে চালিত হতে হবে। রজনীর মাধ্যমে সেই হৃদয়াবেগের কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই নীতিবাগীশ। কর্মফলবাদ নিয়তিবাদ প্রায় প্রতি রচনাতেই থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের। গঙ্গাতীরে আত্মবিসর্জনে উদ্যত রজনীর নবজীবনলাভ ঔপন্যাসিকের সেই নিজস্ব কিছু নিয়মনীতিবাদেরই প্রতিফলনমাত্র। নিষ্কাম কর্ম এবং তার সুফল লাভের আদর্শ প্রতীক হয়ে উঠেছে রজনী।

'রজনী' উপন্যাসটির বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-

> "লর্ড লিটন প্রণীত 'The Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। ...উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকাবিশেষের দ্বারা

ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নুতন নহে। উইলকি কলিন্সকৃত 'Women in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।"৫

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেদিন পম্পেই নগরীর রাজপথ অন্ধকার হয়ে গেল তখন এই অন্ধ নিদিয়াই অবলীলাক্রমে তার প্রণয়ী গ্লকাসকে পথ দেখিয়ে অভিশপ্ত নগরী থেকে বের করে এনে বন্দরের দিকে নিয়ে গিয়ে জাহাজে পৌঁছে দেয়। কারণ অন্ধ নিদিয়ার কাছে অন্ধকার ও আলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর চরিত্রাঙ্কনে এই নিদিয়ার চরিত্র দ্বারা অনেকাংশেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যদিও লিটনের উপন্যাসে অন্ধের পর্যবেক্ষণশক্তির বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য কীভাবে তার হৃদয়ের অনুভূতিকে রূপান্তরিত করে তার বর্ণনা নেই। রজনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনীর প্রেম-ভালোবাসার বিভিন্ন অনুভূতিকেই লেখার মাধুর্য বলে আত্মকাহিনীর কথনরীতির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

নিদিয়া (Nydia)-র ন্যায় রজনী জন্মান্ধ ফুলওয়ালী এবং উভয়ের প্রণয়ের অনুভূতি একই প্রকারের। নিদিয়ার হৃদয়ে যেমন শব্দ এবং স্পর্শের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে প্রণয়সঞ্চার হয়েছে, রজনীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। গ্লকাস্ (Glaucus) নিদিয়ার সর্বস্ব, গ্লকাসের কণ্ঠস্বর তার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, গ্লকাসের স্পর্শ তাকে বিহ্বল করে। এইরূপ, শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর রজনীর কর্ণে বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর, শচীন্দ্রের স্পর্শ তাহার অনুভূতিতে পুষ্পময়। নিদিয়ার প্রতি গ্লকাসের এবং রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আচরণেও কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিদিয়ার প্রতি স্নেহশীল হলেও গ্লকাস তার অন্তরের কথা বুঝতে পারেননি। দরিদ্র ক্রীতদাসীকে তিনি হৃদয়হীন প্রভুত্বের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন, আইওনের (Ione) উদ্ধারকর্ত্রী বলে তিনি তাকে স্বর্ণহার উপহার দিয়েছেন, এর বেশি কোনো কিছু নিদিয়ার আকাঙ্ক্ষনীয় থাকতে পারে, এটা তিনি ভাবতে পারেননি। এইরূপ, অলৌকিক উপায়ে রজনীর ভালবাসার গোপন রহস্য তার নিকট ব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত শচীন্দ্র তার হৃদয়ের গভীরতা অনুমান করতে পারেননি এবং গোপালের সহিত তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে, প্রাপ্ত-যৌবনা অনূঢ়া অন্ধ রজনীর যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন মনে করে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন।

কিন্তু সাদৃশ্য যাই থাকুক, নিদিয়া ও রজনীতে আবেষ্টনগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্যও লক্ষণীয়। নিদিয়া ক্রীতদাসী; বারবো (Burbo) ও তার পত্নীর আশ্রয়ে তাকে বিভীষিকাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, পিতৃমাতৃহীনা হলেও রজনী যাদের আশ্রয়ে বড় হয়েছে, তারা তার পরম আত্মীয় এবং দরিদ্র হলেও তাকে কন্যার স্নেহে পালন করেছে; রজনীও নিজেকে তাদের সন্তান বলেই জেনেছে। বস্তুতঃ, এই নিঃসন্তান দম্পতি রজনীকে এতই ভালবাসত যে, সহসা গোপনে গৃহত্যাগের জন্যও তাকে কোনোরূপ তিরস্কার বা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। উপরন্তু, অমরনাথ যখন বললেন যে, তিনি জেনেছেন রজনী তার কন্যা নয়, হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, বৃদ্ধ রাজচন্দ্র তখন বালিকাকে হারাবার ভয়ে কাতর স্বরে বলল-

"আপনার পায়ে পড়ি, একথা রজনীকে বলিবেন না।"৬

নিদিয়ার নিষ্ঠুর পরিবেষ্টন তাকে কিছুটা কঠিন করে তুলেছিল এবং বালিকা বয়সেই যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত তার পরিচয় ঘটেছিল, সৌভাগ্যক্রমে তা তার চরিত্রের শুভ্রতা নষ্ট না করলেও, তার সকল চিত্তবৃত্তি দুর্দমনীয় করে তুলেছিল-

"The friendless childhood of Nydia had hardened prematurely her character; perhaps the heated scenes of profligacy through which she had passed, seemingly unscathed, had ripened her passions, though they had not sullied her purity."৭

ফলে নিদিয়ার সহজাত মহত্ব পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারেনি-

"Nature had sown in the heart of this poor girl the seeds of virtue never destined to ripen."৮

নিদিয়া যেমন গ্লকাসের প্রণয়ে আত্মবিহ্বলা, তেমনই আইওনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা। গ্লকাসের মুখ চেয়ে আইওনকে সে নারীর চরম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তার এই কার্য সে অন্তরের সহিত সমর্থন করতে পারেনি। উপরন্তু কখনো কখনো সে এর জন্য অনুশোচনা করেছে-

"Often she bitterly repented the service she had rendered to Ione; often she said inly, 'If she had fallen, Glaucus could have loved her no longer;' and then dark and fearful thoughts crept into her breast."৯

রজনী ভিন্ন প্রকৃতির; তার নিকট কর্তব্যের স্থান অন্য সব বিচার বিবেচনার উর্দ্ধে। নিদিয়াকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, রজনীর জীবনের সমস্যা তার থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু শচীন্দ্র যদি গ্লকাসের ন্যায় অন্য রমণীতে আসক্ত হতেন, তাহলে রজনী কখনও নিদিয়ার ন্যায় কোনোরূপ মন্ত্রৌষধির সাহায্যে তার ভালবাসা কেড়ে নিতে চেষ্টা করত না। পক্ষান্তরে, লবঙ্গ উপযাচিকা হয়ে তাকে 'শচীন্দ্রদান' করতে চাইলে রজনী যেমন প্রাণদাতার প্রতি কর্তব্য স্মরণ করে সেই দান প্রত্যাখ্যান করল, অনুরূপ অবস্থায় নিদিয়া কখনও সেরূপ স্বার্থত্যাগ করতে পারত না। নিদিয়া গ্লকাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে পারে, কিন্তু কর্তব্যের প্রেরণায় তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারে না। নিদিয়ার প্রেম পর্বতগাত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বেগবতী; রজনীর প্রেম অতলস্পর্শী সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় শান্ত ও নিস্তরঙ্গ। ব্যর্থ প্রেমিকা নিদিয়ার জীবনের পরিণতি করুণ; তরুণ বয়সেই সমুদ্রের জলতলে তার ঈর্ষার সহিত তার সকল আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে সাংসারিক সুখে সুখী করেছেন।

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রজনী-চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে আমরা সাধারণত দেখেছি পুরুষের রূপমুগ্ধতা; নারী সেখানে পুরুষের চিত্তে আকর্ষণ সৃষ্টি করে তার রূপের ডালি মেলে ধরেছে। কিন্তু রজনী নারী হওয়া সত্বেও তার রূপমোহ ও কাতরতা বঙ্কিম-সাহিত্যে ব্যতিক্রম। অন্ধ রজনীর সাহায্যে বঙ্কিম দেখিয়েছেন, নারীর দৈহিক গঠনে প্রকৃতি কার্পণ্য করলেও সে নারী। সে অলজ্ঘ্য বিধানে বসন্তে কুসুম ফোটে, ভ্রমর গুঞ্জন তোলে, সেই অলজ্ঘ্য বিধানেই অন্ধ হোক, খঞ্জ হোক, একদিন এক শুভ মুহূর্তে সে নিজের পরিচয় পায় এবং পর্বতনিঃসৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় নিজ প্রেমধারা প্রেমাস্পদের চরণে উৎসর্গ করবার জন্য তার দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ এটা বোঝে না, সুতরাং সাধারণের মাপকাঠিতে কেউ তার বিচার করে না। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে যায় এবং সমাজে সে থাকে নিতান্তই অপাঙ্ক্তেয়। রজনী জন্মান্ধ; কিন্তু অন্ধ বলে প্রস্তরে খোদিত চক্ষুশূন্য মূর্তির ন্যায় সে কি শুধু পাষাণ প্রতিমা? সাধারণ মানুষ হয়ত তাই মনে করবে। সেজন্য শচীন্দ্র প্রশ্ন করেছেন-

"যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে?"১০

এ প্রশ্ন শুধু শচীন্দ্রের নয়, শচীন্দ্রের মারফত তা আসলে সাধারণের মনোভাবের অভিব্যক্তি। কিন্তু হোক রজনী অন্ধ, অন্ধ বলে কারও হৃদয়দুয়ার চিরদিনের জন্য দরজা বন্ধ থাকে না। অন্ধ রজনীর রূপমুগ্ধতার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি সত্যকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন-

"শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? ...তবে কি সেই স্পর্শ? ..রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র- শব্দও মানসিক বিকার। রূপ, রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে- নহিলে একজনকে সকলে সমান রূপবান দেখে না কেন? ...রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?"১১

## Conclusion:

উপন্যাসের 'রজনী' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। রজনী অন্ধ যুবতী। তার কাছে পৃথিবীর আলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। চির-অন্ধকারময় জগতে যে বিরাজ করে, সেই নারীর 'রজনী' নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ পরিপূর্ণ পৃথিবীকে মান্য আস্বাদ করে। কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব রজনীর অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে অনেক বেশী প্রখর করে তুলেছে। রজনী সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে রজনী ফুলওয়ালী। ফুলের কোমল পেলব

স্পর্শ অন্ধ রজনীর চিত্তে কোমল স্পর্শানুভূতির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে এবং ফুলের ঘ্রাণ চিত্তের উপর প্রভাঁব বিস্তার করেছে। ফলে চক্ষুর দ্বারা যে সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চিত্তের জাগরণ ঘটতো, চক্ষুর অভাবে সেই সৌন্দর্যের মহিমা সে উপলব্ধি করেছে ঘ্রাণের দ্বারা এবং স্পর্শের দ্বারা। তাই অন্ধ রজনীকে ফুলওয়ালীরূপে চিত্রিত করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্ধের শ্রবণশক্তির প্রখরতা। এই স্পর্শানুভূতি ও শ্রবণানুভূতি তাকে শচীন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, প্রেমের পদধ্বনি শোনা গেছে রজনী-চিত্তে শচীনকে কেন্দ্র করে।

Reference:


১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৮৯৫)। রজনী, হেয়ার প্রেস, পৃষ্ঠা- ৭৮

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩-৪

৫. পূর্বোক্ত, ভূমিকা

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭২

৭. Lytton, E.B. (1834). The Last Days of Pompeii, Chap. IV, Dana Estes & Company Publishers, p. 188

৮. পূর্বোক্ত, Chap. XI, p. 30

৯. পূর্বোক্ত, Chap. IV, p. 187

১০. পূর্বোক্ত, রজনী, পৃষ্ঠা- ৭৬

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫



**Citation: Singha Mahapatra. S.,** (2025) "বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী : প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ, অভিনবত্ব ও পাশ্চাত্যনুসরণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.